দৈনিক সংবাদ

23

তারিখ 09 SEP 1990
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

এসএসসি পরীক্ষায় পাস ফেল ও নকল

গত পাঁচ বছরে এসএসসি পরীক্ষায় পাসের হার ক্রমাগত কমছে। গত '৮৬ সালে যেখানে এসএসসি পরীক্ষায় পাসের হার ছিল ৬৬ শতাংশের ওপর এবার তা কমে এসে দাঁড়িয়েছে ৩২ শতাংশের চেয়ে কিছুটা নীচে। অর্থাৎ পাসের হার অর্ধেকেরও কম ১৯৮৬ সালের তুলনায়।

এই পাসের হার কমে যাওয়ার মধ্য দিয়ে আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থার করুণ চিত্রটাই স্পষ্ট হয়েছে।

এবার এসএসসি পরীক্ষার্থীর মোট সংখ্যা ছিল ৪ লাখ ৩৬ হাজারের কাছাকাছি। পাস করেছে মাত্র এক লাখ ৩৮ হাজারের কিছু ওপরে। ১৯৮৬ সালে পরীক্ষার্থী ছিল ৩ লাখ ৬৬ হাজারের ওপর। পাসের সংখ্যা ছিল ২ লাখ ৪১ হাজার। অর্থাৎ গত পাঁচ বছরে কৃতকার্য পরীক্ষার্থীর সংখ্যাও কমে এসে দাঁড়িয়েছে অর্ধেকের কাছাকাছি।

ছাত্রসংখ্যা বাড়লেও পাসের হার ক্রমাগত নিম্নমুখী। সরকার এই চিত্রকে শিক্ষাব্যবস্থার অবনতির সঙ্গে যুক্ত করে না দেখে এটাকে তাদের কৃতিত্ব বলে দাবী করছেন। তাদের যুক্তি হল নকলপ্রবণতার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার ফলেই অনুত্তীর্ণ ছাত্র সংখ্যা বেড়েছে। পাসের হার ও সংখ্যা কমে যাওয়ার পক্ষে এই যুক্তি সাধারণ জ্ঞানগম্যি আছে এমন লোকের মনেও কৌতুক উদ্রেক করবে।

প্রশাসনিক কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার ফলে নকল করতে না পেরে ছাত্ররা ফেল করেছে, এটাই সরকারী বিশ্লেষকদের বক্তব্য। তারা এধরনের কথা গতবারও বলেছেন। পাসের হার পূর্ববর্তী বছরের শতকরা ৫৪·২১ ভাগ থেকে শতকরা ১১ ভাগের ওপর হ্রাস পেয়ে গতবার ৪২·৯০ শতাংশে কেন হল, তার পক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে নকল রোধে সরকারী সাফল্যের গর্ব করে চমক লাগিয়ে দিয়েছিলেন সরকারী মুখপাত্রগণ। দেশবাসী বুঝে হোক না বুঝে হোক হাততালি দিয়ে সরকারকে অভিনন্দন জানিয়েছিল। এবার তাতে অধিকতর সাহসী হয়ে যখন পাসের হার আরও দশ শতাংশের ওপর কমেছে, তখন গতবারের যুক্তিটা সরকার নির্ভয়ে পাকা করে নিলেন। আর জোরালো যুক্তি দিলেন নিজেদের সাফল্যের সপক্ষে যে, এবার কোন কেন্দ্র বাতিল করা হয়নি।

এবার ২১ হাজারের ওপর নকলকারী বহিষ্কৃত হয়েছে। পরীক্ষায় ফেল করেছে দু-তৃতীয়াংশের ওপর। শুধু নকল রোধের জন্যই ছাত্ররা ফেল করেছে এটাই যদি যুক্তি হয় তবে স্কুলগুলোতে পড়াশোনা কতটা হয়েছে, তারও একটা চিত্র তুলে ধরা উচিত ছিল। এত ছাত্র নকল করে কেন কিংবা নকলের সুযোগ না পেয়ে ফেল করে কেন সে কথাটা নিয়ে সরকারী মহলের দুশ্চিন্তা নেই। সম্ভবত আমাদের দেশের শিক্ষাব্রতীদের অনেকেই এনিয়ে কম ভাবনা-চিন্তা করেন এবং কেন এমনটি হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন রাখছেন না।

নকল করার প্রবণতা উৎসাহ পায় তখনই যখন দেখা যায় যে, শ্রেণীকক্ষে পঠন-পাঠন উপেক্ষিত হচ্ছে। শিক্ষকরা ক্লাসে পড়ানো অপেক্ষা ব্যাচে পড়িয়ে থাকেন। অধিক অর্থ উপার্জনের লক্ষ্যে শিক্ষকদের একাংশের এই কোচিং ব্যবস্থায় অনিবার্যভাবে ক্লাসে ছাত্র পড়ানোর ব্যাপারটি উপেক্ষিত থাকে।

এধরনের শিক্ষকরা সকাল-সন্ধ্যা তথা অনেক রাত পর্যন্ত কোচিং করিয়ে দিনের বেলা ক্লাসে এসে ক্লান্ত বোধ করবেন এটাই স্বাভাবিক। ফলে পড়াশোনার কাজটা সুষ্ঠু হয় না এবং বিপুল ছাত্র-ছাত্রীরা ক্লাসে পড়ানো থেকে উপকৃত হওয়া থেকে বঞ্চিত থাকে। ছাত্র-ছাত্রীদের সিংহভাগ তথা রাজধানীসহ কয়েকটি প্রধান শহরের দু'চারটি ভাল স্কুল ছাড়া ক্লাসে শিক্ষকদের সাহায্য পায় না। সুতরাং শুধু নকলবাজ নয়, এমন বহু ছাত্র-ছাত্রী অনিবার্যভাবে পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে থাকে।

নকল করার সুযোগহারা ছাত্র-ছাত্রীরা অকৃতকার্য হয়েছে এবং সৎ ও পরিশ্রমী ছাত্র-ছাত্রীরা উত্তীর্ণ হয়েছে পরীক্ষায়, এই সহজ সমীকরণে বিশ্বাস করতে পারলে ভাল হত।

কয়েকমাস আগে একটি খবর প্রকাশিত হয়েছিল প্রশাসনের ছত্রছায়ায় এবং স্থানীয়ভাবে ক্ষমতাধর সরকারী কর্মচারীর একটি পুত্র কীভাবে এসএসসিতে প্রথম স্থান এবং অপর একটি সন্তান এইচএসসিতে কৃতিত্ব নিয়ে মেধা তালিকায় স্থান পেয়েছিল।

এবারও 'একজন পরীক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা' এধরনের শিরোনামে একাধিক চিঠি এসেছে। তাতে বলা হয়েছে, কীভাবে শিক্ষকদের সহায়তায় ছাত্র-ছাত্রীরা 'শান্তিপূর্ণভাবে' নকল করে। আপত্তি জানিয়েছিল এমন একজন ছাত্রীকে জনৈক শিক্ষক এই বাস্তব জ্ঞান দেয় যে, লোকে তোমার পড়াশোনা দেখবে না, দেখবে পরীক্ষার রেজাল্ট।

সুতরাং এবার কোন কেন্দ্র বাতিল না হওয়ার মূলে কাজ করেছে নকলের টেকনিক বদল; যেখানে একশ্রেণীর শিক্ষক, অভিভাবক এবং কোন কোন ক্ষেত্রে প্রশাসনের দুর্বলতা ও বোধগম্য কারণে প্রশাসনের শিথিলতা ছাত্রদের একাংশকে শান্তিপূর্ণ নকল করতে উৎসাহিত করেছে এবং তাদের সাফল্য এনে দিয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে এদের হার কোনদিনই জানা যাবে না।

এসব অপ্রমাণিত কিন্তু অসত্য বলে অবিশ্বাস করার মত জোরালো কোনো যুক্তি দেয়া কঠিন। পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস থেকে শুরু করে পরীক্ষার হলে ছাত্র-শিক্ষক সহযোগিতার ব্যাপারটি থেকে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় ধস যে কত ব্যাপক তা বোঝা যায়।

শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদান ব্যবস্থার ব্যাপক অবনতির পাশাপাশি যে বিপুলসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর অভিভাবক যাদের একাধিক গৃহশিক্ষক রাখার মত অবস্থা নেই, কিংবা অনেকের যেখানে গৃহশিক্ষক রাখার মতই আর্থিক অবস্থা নেই, তাদের সন্তানরা যখন অকৃতকার্যতার পাল্লা ভারী করে—সেখানে নকল রোধের সাফল্যের নজির হিসেবে পাসের হার কমের যুক্তির অপর পিঠটি আমাদের চোখে পড়ে না। তাহল স্কুলে শিক্ষাদানের ব্যাপারটি প্রকৃতপক্ষে একটি আনুষ্ঠানিকতায় পর্যবসিত হয়েছে। ছাত্রদের লেখাপড়া শিখানোর ব্যবস্থাটা সেখানে বিরাজ করছে না।

প্রথম শ্রেণী থেকে গৃহশিক্ষক রাখার মত প্রয়োজনের সৃষ্টি যে আসলে শিক্ষাব্যবসা, শিক্ষাদান নয়, একথাটা অস্বীকার করা চলে না।

দু-তৃতীয়াংশের ওপর পরীক্ষার্থী যেখানে অকৃতকার্য হয়, তা নকল না করার কিংবা নকলের সুযোগ হারানোর পরিণতি একথা বলার অর্থ হল নদীতে তলিয়ে যাওয়া ভূমির দলিল দেখিয়ে মামলা করে তা জিতে নেয়ার নিষ্ফলতার মতই।

এভাবে শিক্ষার দৈন্যদশাকে কলুষমুক্ত শিক্ষা হিসেবে চালিয়ে দেয়ার মধ্যে সূক্ষ্ম নৈয়ায়িক বুদ্ধির পরিচয় মিলতে পারে। সেখানে চমক দেয়ার কলাকৌশলই কাজ করে। আসল ব্যাধিটা থাকে আড়ালে।

আর তা হল অশিক্ষা বিস্তারের ব্যাধি। ছাত্রদের পাসের হার মাত্রাতিরিক্ত কমে যাওয়ার ব্যাপারটি উপরোক্ত ব্যাধির উপসর্গ, নকল করার ব্যাধির উপশম হওয়ার লক্ষণ নয়।